মিডিয়া প্রফেশনালস গ্রুপের একটি উদ্যোগ

৩১ মার্চ ২০২১

সকলের কথা

বর্ষ ৭ সংখ্যা ২৪

মূল্য : ২০ টাকা

www.shokolerkotha.com Reg. DA No. ৬৩৫৮

স্থানীয় সরকার বিষয়ক দেশের প্রথম পত্রিকা

এলাকায় নির্মিত কাঠের সেতু

সাজেক ইউনিয়ন পরিষদ থেকে সেবা পাওয়ার জন্য পায়ে হেটে পরিষদে পৌঁছতে এলাকাবাসীর এক বা দু'দিন লেগে যায়

বিশ্বজিত চক্রবর্তী
সচিব, সাজেক ইউনিয়ন পরিষদ
বাঘাইছড়ি উপজেলা, রাঙ্গামাটি

রাঙ্গামাটির সাজেক ভ্যালি এই ইউনিয়ন পরিষদে অবস্থিত। ভ্যালি থেকে ইউনিয়ন পরিষদ অফিসের দূরত্ব প্রায় ৩৪ কিলোমিটার। এই ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় বর্তমানে সড়ক তৈরি হচ্ছে। এখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ করাই জরুরি কাজ। তবে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের কাজ হচ্ছে। কিছু এলাকায় ইতোমধ্যে বিদ্যুৎ পৌঁছেছে। সীমান্ত এলাকার মানুষ কখনো ভাবেননি যে, সেখানে রাস্তা হবে, কিন্তু এখন সেখানে রাস্তা হচ্ছে। আমরা আশাবাদী যে, আগামী দুই থেকে চার বছরের মধ্যে এই এলাকা উন্নত হবে। এই এলাকায় রাস্তা ও গাড়ির ব্যবস্থা না থাকায় এলাকাবাসী পায়ে হেটেই যাতায়াত করেন।

একটি ওয়ার্ড থেকে অন্য ওয়ার্ডের দূরত্ব কমপক্ষে একদিনের পায়ে হাটার পথ

ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ভিজিডি, ভিজিএফ, বয়স্ক ভাতাসহ অন্যান্য সুবিধা নিতে হলে তাদেরকে পায়ে হেটে পরিষদের পৌঁছতে এক বা দু'দিন লেগে যায়। এভাবেই তারা কষ্ট করে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে সেবা নিয়ে থাকেন। এ ইউনিয়নের একটি ওয়ার্ড থেকে অন্য ওয়ার্ডের দূরত্ব কমপক্ষে একদিনের পায়ে হাটার পথ।

৩য় পৃষ্ঠায় পড়ুন.....

সন্তোষপুর ইউনিয়ন পরিষদের সুন্দর কাজের পরিবেশ তৈরির উদ্যোগ অন্যরা অনুকরণ করছে

কে এম জুলফিকার হায়দার
সচিব, সন্তোষপুর ইউনিয়ন পরিষদ
চিতলমারী উপজেলা, বাগেরহাট

সুসজ্জিত পরিষদ ভবন

আমি যখন সচিব হিসাবে যোগদান করি তখন পরিষদের পরিবেশ কাজের সহায়ক ছিলো না। এমন কি নথিপত্রগুলো যথাযথভাবে তৈরি ও সংরক্ষণ করা হতো না। তাই আমি ভাবলাম এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করা দরকার। নথিপত্র তৈরি ও সংরক্ষণের জন্য একটি সিস্টেম তৈরি করলাম যা পরে বাগেরহাট জেলার উপ পরিচালক, স্থানীয় সরকার (ডিডিএলজি) মহোদয়কে দেখালাম। তিনি দেখে খুশি হলেন। কম্পিউটারে বিভিন্ন ফাইল রাখার জন্য পৃথকভাবে যেভাবে ফোল্ডার করা হয়, আমি সেরকম পৃথক পৃথক কাজের জন্য ৪০টি বাক্সের সাধ্যমে আমার অফিস কক্ষকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে দিলাম। এতে করে আমি অথবা সংশ্লিষ্ট যে কারোরই নথি খুঁজে পেতে অসুবিধা হয় না। এটি আমি ২০১২ সালে শুরু করি। গত সাড়ে ৩ বছর আগে এটি আবার আপডেট করি। অনান্য ইউনিয়ন পরিষদগুলোর ফাইলিং সিস্টেম যেনো সুশৃংখল হয় সেজন্য উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার আমার পদ্ধতিটি অনান্য সচিবদের দেখানোর উদ্যোগ নিলেন। এরই অংশ হিসেবে প্রথমে নয়টি ইউনিয়ন পরিষদের নয়জন সচিবকে আমার অফিসে ফাইলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেই। পরবর্তীতে যারা সচিব হিসাবে কাজে যোগদান করেন তাদেরকেও আমি একই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছি।

জনগণ বিভিন্ন কাজ নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদে আসেন। তাদের চাহিদামাফিক সেবা দেয়াই সচিবের কাজ। চাহিদামাফিক কাজ না পেলে তাদের মধ্যে অসন্তুষ্টি দেখা দিতেই পারে। কিন্তু

২য় পৃষ্ঠায় পড়ুন.....

'এইচএলপি ফাউন্ডেশন আগামীদিনে দেশ ও বিদেশে উত্তম চর্চা সম্প্রসারণে কাজ করবে'

মো. সফিকুল ইসলাম
প্রেসিডেন্ট, এইচএলপি ফাউন্ডেশন

উত্তম চর্চা নিয়ে কথা বলছেন মো. সফিকুল ইসলাম

এইচএলপি (পারস্পরিক শিখন কর্মসূচি) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে যথেষ্ট কাজে লাগছে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে ভালো কাজ চিহ্নিত হচ্ছে এবং এই ভালো কাজ সম্পর্কে যাদেরকে জানানো হচ্ছে ও যারা এ কাজ বাস্তবায়ন করছে, তারা সবাই উপকৃত হচ্ছে। কারণ এ কর্মসূচির কাজে স্বচ্ছতা অনেক বেশি। কোন কাজের সিদ্ধান্ত কীভাবে হচ্ছে, কীভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে, কীভাবে ফল পাওয়া যাচ্ছে-সবই এরই মাধ্যমে জানা যাচ্ছে। কারণ ভালো শিখন চিহ্নিতকরণ থেকে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্টদের সম্পৃক্ততা থাকছে। অংশগ্রহণমূলক এই প্রক্রিয়ায় সবার মতামতকে গুরুত্ব দেয়া হয়। এখানে গভার্নেন্স বিষয়গুলো ভালোভাবে তুলে ধরা হয়।

এই কর্মসূচির প্রভাব বুঝার জন্য এ কাজের ধারাবাহিকতা কতটুকু বজায় ছিলো তা জানা দরকার। কোন ভালো কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায় এক ধরনের চ্যালেঞ্জ রয়েছে। আনন্দের বিষয় যে, অনেক ইউনিয়ন পরিষদ নিজেরাই নিজেদের অর্থে এ প্রক্রিয়ায় কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ২০০৭ সাল থেকে স্থানীয় সরকার বিভাগ ও বিশ্বব্যাংকের ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন প্রোগ্রাম (ডব্লিউএসপি) যৌথভাবে ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে পারস্পরিক শিখন কর্মসূচির (এইচএলপি) কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে এ কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ওয়াটারএইড বাংলাদেশ ও জাইকা সহায়তা প্রদান করে। জাতীয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (এনআইএলজি) এইএলপি'র হাল ধরে। এখন পর্যন্ত এনআইএলজি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা

৩য় পৃষ্ঠায় পড়ুন.....

'আমরা চাই ইউনিয়ন পরিষদের সচিব ও হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটরের বেতন পুরোপুরি সরকারের পক্ষ থেকে দেয়া হোক'

শেখ হাবিবুর রহমান
সচিব, রাখালগাছি ইউনিয়ন পরিষদ
কালীগঞ্জ উপজেলা, ঝিনাইদহ

বক্তব্য রাখছেন শেখ হাবিবুর রহমান

ইউনিয়ন পরিষদের কাজে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। আমি ৩০ বছর যাবৎ সচিব হিসাবে কাজ করছি। এরই মধ্যে আমি চারটি ইউনিয়ন পরিষদে কাজ করেছি। আমি আগেও এ ইউনিয়ন পরিষদে কাজ করেছি, কিন্তু বর্তমানে এ ইউনিয়ন পরিষদে তিন বছর যাবৎ কাজ করছি। ইউনিয়ন পরিষদ হচ্ছে তৃণমূলের জনগণকে সরকারের সেবা দেয়ার একটি প্রতিষ্ঠান। তা সত্ত্বেও আগে জনগণকে সেবা দেয়ার জন্য ইউনিয়ন পরিষদে সেভাবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কাজ হতো না। এখন যেমন প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ সরকারের অফিসসূচি অনুযায়ী চলে, আগে সেভাবে পরিচালিত হতো না। সরকারের অফিসসূচির বাইরেও এখন ইউনিয়ন পরিষদে কাজ হয়। আগে এক সময় ইউনিয়ন পরিষদ ছিল চেয়ারম্যান কেন্দ্রিক। চেয়ারম্যান ইচ্ছে মত অফিস চালাতেন। মানুষকে সেবা পেতে হলে তখন সেভাবেই চলতে হতো। তিনি যেখানেই থাকতেন সেখানই অফিস ছিল। আগে ইউনিয়ন পরিষদে এখনকার মতো এতো কাজ ছিল না। বর্তমান ধারাটা প্রায় গত ১০ বছর যাবৎ চলছে।

২য় পৃষ্ঠায় পড়ুন.....

সকলের কথা (একটি পাক্ষিক প্রকাশনা), ঢাকা ॥ বর্ষ ৭ সংখ্যা ২৪ ॥ ১৬-৩১ মার্চ ২০২১

সম্পাদক
সমর রায়

যোগাযোগ
মিডিয়া প্রফেশনালস গ্রুপ, ২৭ শহীদ বুদ্ধিজীবি মুনীর চৌধুরী সড়ক (সেন্ট্রাল রোড), ঢাকা ১২০৫ ,ফোন : ৯৬৬৭২৮৪, ০১৭১৩ ০০২৮০৮ ই-মেইল : mediaprofessionals@gmail.com

সন্তোষপুর ইউনিয়ন পরিষদের সুন্দর কাজের পরিবেশ তৈরির উদ্যোগ অন্যরা অনুকরণ করছে

..... ১ম পৃষ্ঠার পর

আমাদের কাজ হলো তাদেরকে বুঝিয়ে তাদের কাজটি করে দেয়া। আমি যখন এভাবে কাজ করি জনগণ যেমন সন্তুষ্ট হন, ঠিক তেমনি আমিও তখন সন্তুষ্ট থাকি।

এক সময় ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত নেতারা যথাযথ পোশাক না পরেই পরিষদে আসতেন। তারা পরিষদে তাদের মতো করে চলতে চেষ্টা করতেন কিন্তু আমি তাদের সাথে আলোচনা করে সে পরিস্থিতিরও উন্নতি ঘটাই। আমি দাবি করতেই পারি যে, বর্তমানে আমার ইউনিয়ন পরিষদে আদর্শ পরিবেশ বিরাজ করছে।

ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বেশিরভাগ কাজই অনলাইনে করতে হয়। ইউনিয়ন পরিষদে এমআইএস (ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম) কার্যকর রয়েছে। আমি স্থায়ী কমিটির কার্যক্রমগুলো একটি বিশেষ রেজিস্টারে নথিভুক্ত করি। আমার এখানে স্থায়ী কমিটিগুলোর সভা নিয়মিত হয়। ওয়ার্ড সভাগুলো আমি নিয়মিত করি। এগুলোর তথ্য এমআইএসে না দিলে স্কিম অনুমোদিত হয় না। প্রতিটি কাজের সময় ও তারিখসহ ছবিও এমআইএসে দিতে হয়। জনগণের চাহিদা পুরোপুরি মেটানো সম্ভব হয় না। তাদের চাহিদাগুলো জেনেই চেয়ারম্যান ও মেম্বাররা স্কিম নির্বাচন করেন। আমার এখানে উন্মুক্ত বাজেট সভা নিয়মিত হয়।

আমি একসময় ভাবলাম যে, জনগণের সুবিধার জন্য এম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যা এলাকাবাসীর আকস্মিক প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবায় সহায়ক হবে। পরবর্তীতে এলজিএসপি'র অর্থে আমরা এম্বুলেন্সটি কিনি। জনগণ যাতে এই এম্বুলেন্সের সেবা ২৪ ঘন্টা সেবা পেতে পারেন এজন্য এম্বুলেন্সের ড্রাইভারের নাম্বার সবার দরজায় পৌঁছে দেয়া হয়েছে। আমরা এম্বুলেন্স থেকে যে সেবামুল্য পাই তা দিয়ে গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ও চালানোর ব্যয় নির্বাহ করতে পারি। প্রায় তিন বছরের মত এম্বুলেন্সটি এলাকাবাসীকে সেবা দিয়ে যাচ্ছে। এম্বুলেন্স মাসে গড়ে ২৫ থেকে ৩০টি ট্রিপ দিয়ে থাকে। আমার ইউনিয়নে দুটি কমিউনিটি ক্লিনিক রয়েছে। তাদের সেবা প্রার্থীরাও এ এম্বুলেন্সের সেবা ভোগ করেন।

পরিষদের চেয়ারম্যান বিউটি আক্তার ও সচিব কে এম জুলফিকার হায়দার

'আমরা চাই ইউনিয়ন পরিষদের সচিব ও হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটরের বেতন পুরোপুরি সরকারের পক্ষ থেকে দেয়া হোক'

..... ১ম পৃষ্ঠার পর

এখন জন্মনিবন্ধন ছাড়া কোন কার্যক্রমই করা সম্ভব না। ইউনিয়ন পরিষদে বর্তমানে ব্লক সুপারভাইজার ও উপসহকারি কৃষি কর্মকর্তা থাকেন। ভূমি সহকারি কর্মকর্তা এবং মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা এখানে থেকে সেবা দেন। ইউনিয়ন পরিষদে ডিজিটাল সেন্টার রয়েছে, এটি ২০১১ সাল থেকে চালু হয়েছে। ইতোমধ্যে ইউনিয়ন পরিষদে একজন হিসাব সহকারি কাম কম্পিউটার অপোরেটর দেয়া হয়েছে। এ পদে এখনো সারাদেশে নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ হয়নি। তবে ঝিনাইদহ জেলার ৪৯ জনের নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই তারা কর্মস্থলে যোগ দিবেন।

আমরা মনে করি, ইউনিয়ন পরিষদের প্রতি সরকারের যথেষ্ট দৃষ্টি রয়েছে। লোকবল পেলে ইউনিয়ন পরিষদ আরও স্বচ্ছতার সাথে অর্পিত দায়িত্বগুলো সুচারুরূপে করতে সক্ষম হবে। এলজিএসপি'র কার্যক্রম যখন থেকে শুরু হয়েছে তখন থেকেই ইউনিয়ন পরিষদের নিয়মিত অডিট হয়। যার কারণে আমাদের কাজের জবাবদিহিতা বেড়েছে। কর আদায়ের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব আয় বাড়ানোর কাজও গতিশীল হয়েছে। এখন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সচিব কর আদায়ে বেশ সচেতন। তবে এখনও ইউনিয়ন পরিষদ স্বাবলম্বী না। কারণ হাটবাজার বাজার ইজারা থেকে আয় এবং ভূমি হস্তান্তরের ১ শতাংশ থেকে যা আয় হয় তা কিছু সংখ্যক শহরকেন্দ্রিক ইউনিয়ন পরিষদ পেয়ে থাকে। অধিকাংশ জেলাতেই ১ শতাংশের আয় ইউনিয়ন পরিষদে আসে না। তাই নির্বাচিত প্রতিনিধি, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের যে সম্মানী বা ভাতা ইউনিয়ন পরিষদের পরিশোধ করার কথা তা ইউনিয়ন পরিষদ পুরোপুরি পরিশোধ করতে পারছে না। আমরা চাই ইউনিয়ন পরিষদের সচিব ও হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটরের বেতন পুরোপুরি সরকারের পক্ষ থেকে দেয়া হোক। তাহলে ইউনিয়ন পরিষদের কাজ আরও গতিশীল হবে বলে আমার বিশ্বাস।

আগে যারা ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত প্রতিনিধি হতেন তাদের এ পদের বিনিময়ে আয় না থাকলেও তারা জনগণের জন্য নিবেদিত হয়ে কাজ করতেন। এখন ইউনিয়ন পরিষদের আয় আগের তুলনায় বেড়েছে, তাছাড়া এখানকার নেতৃত্ব প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষিত সেদিক বিবেচনায় বর্তমান নেতৃত্ব বাস্তবতার সাথে কাজ করার অনেক বেশি সক্ষম। এখন তারা ইউনিয়ন পরিষদে বসেই জনগণের জন্য কাজ করছেন।

প্রতিটি ওয়ার্ডে ওয়ার্ড সভা করার পরেই জনগণের চাহিদা মোতাবেক প্রকল্প সংগ্রহ করে সেগুলোর বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। ইউনিয়ন পরিষদে ১৩টি স্থায়ী কমিটি রয়েছে। এ স্থায়ী কমিটির মাধ্যমে তৃণমূল থেকে আসা প্রকল্পগুলো যাচাই বাছাই করা হয়। জনগণের চাহিদার ভিত্তিতে এ প্রকল্পগুলো নেয়া হচ্ছে।

ইউনিয়ন পরিষদে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ভাতা নিয়মিত যোগান দেয়ার মত পরিষদের যথাযথ আয় না থাকা। স্থানীয় পর্যায়ে যারা বসবাস করেন তাদের বেশিরভাগ আর্থিকভাবে কিছুটা হলেও অন্যদের তুলনায় অস্বচ্ছল। কাজেই তাদের কাছ থেকে কর আদায় করে আয়ের ব্যবস্থা করা সহজ কাজ নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে পরিষদ চাইলেও জনগণের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে সেটি আদায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা তেমন আগ্রহী থাকেন না। জনগণের প্রশ্ন, কর কেনো তারা দিবেন? এ কর থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তারা চেয়ারম্যান ও মেম্বারের কাছে দাবি জানান। চেয়ারম্যান ও মেম্বাররাও তাদের দাবির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। আমরা জানি যে, সরকার ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের ভাতা জনগণকে দিয়ে থাকে। যার মাধ্যমে এখানে সরকার বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করছে।

ইউনিয়ন পরিষদের আয়ের বিকল্প উপায় কী হতে পারে? এখন বিভিন্ন ইউনিয়ন শতভাগ বিদ্যুতায়িত হয়েছে। বিদ্যুতের উপর যদি পরোক্ষ কর আরোপ করা হয় তাহলে ভালো হতো। যারা ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ট্রেড লাইসেন্স করেন তারা ট্রেড লাইসেন্স ফিস দিয়ে থাকেন। ট্রেড লাইসেন্সের ফিস আদায় করতে পারলেও ব্যবসায়িক কর আদায় করা আমাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। আমরা যখন কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কর আদায় করতে যাই তখনি এ বিষয়ে জটিলতা হয়। আমরা যদি ট্রেড লাইসেন্স ফিসের সাথে ব্যবসায়িক কর আদায় করতে পারতাম তাহলে ব্যবসায়িক কর আদায় করা সহজ হতো।

নির্বাচিত নেতারা টিআর, কাবিখা, অতিদরিদ্রের কর্মসৃজন কর্মসূচির অর্থ দিয়ে রাস্তাঘাট, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ও স্যানিটেশন সুবিধাসহ ছোট ছোট কাজগুলো করে থাকেন। এখন সচেতনতা তৈরি করা হচ্ছে যে, কেউ যদি একটি সুবিধা পান তিনি যেনো আরেকটি সুবিধার দাবিদার না হোন বা না পান।

এলাকার কমিউনিটি ক্লিনিক নিয়মিত স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে থাকে। বর্তমানে তারা সকাল ৯টা থেকে দুপুর সাড়ে ৩টা পর্যন্ত সেবা দিয়ে থাকেন। বয়স্ক লোক, মাতৃত্বসেবা এবং পরিবার পরিকল্পনাসহ অন্যান্য সেবা সেখানে তারা পেয়ে থাকেন। এ ইউনিয়নে একটি পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র আছে। এখনও অনেকেই এসব সেবা সম্পর্কে সচেতন নন। তাদেরকে সেবাগুলো নিতে উদ্বুদ্ধ করছি। সেখানে ডায়াবেটিস ও ব্লাড প্রেসার মাপার যন্ত্র রয়েছে। এসব রোগেরও ওষুধও সেখানে সরবরাহ করা হচ্ছে।

জন্ম নিবন্ধনের কাজ করতে গিয়ে ইউনিয়ন পরিষদকে বেশি সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। সার্ভার সব সময় কাজ না করায় সময়মত জনগণকে সেবা দেয়া যায় না। এখন একটি শিশুর জন্ম নিবন্ধন করতে গেলে তার পিতা ও মাতার জন্ম নিবন্ধন যদি না থাকে তবে তার নিবন্ধন করা যাচ্ছে না। জন্ম নিবন্ধন আগে থেকে করার বিধান থাকলেও গ্রামের সকল লোকের এখনও পর্যন্ত জন্ম নিবন্ধন হয়নি বা হলেও তাদের কাছে সংরক্ষিত না থাকায় অথবা ইউনিয়ন পরিষদের ডিজিটাল সিস্টেমে না থাকায় জন্মনিবন্ধন করে দেয়া যথেষ্ট সমস্যা হচ্ছে। এখানে থার্ড অপশন না থাকায় একজনের দু'বার নিবন্ধনের সুযোগ থেকে যাচ্ছে। কারো মৃত্যু হলে ওয়ারিশ সার্টিফিকেট নিতে গেলে মৃত্যু নিবন্ধন করতে হয়। আগে যেমন একজন মারা গেলে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের মেম্বার প্রত্যয়নপত্র দিলেই হতো। এখন মৃত্যু নিবন্ধন করতে গেলে তার জন্মনিবন্ধনের দরকার পড়ছে। কাজেই তার জন্ম নিবন্ধন করেই মৃত্যু নিবন্ধন করতে হচ্ছে। সার্ভার সবসময় কার্যকর না থাকায় এ কাজগুলো করতে আসা জনগণ ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। আমাদের জনবল না থাকায় আমরাও বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছি। এ কারণে মানুষের মধ্যে অনেক সময় অসন্তুষ্টি দেখা দিচ্ছে। এমনকি এ বিষয়ে জনপ্রতিনিধিদেরও চাপ আমাদের উপরে আসছে। অনেকেই সার্ভারের সমস্যার কথা বুঝতে চান না। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষ নজর দিলে আমরা এ বিষয়ে জনগণকে যথাযথ সেবা দিতে পারবো।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের অনুষ্ঠান

এটি সকলের কথা'র ১৬৮তম সংখ্যা। এর অনলাইন পাঠক সংখ্যা এক লাখেরও বেশি।
স্থানীয় সরকার বিষয়ক কাজে নিয়োজিতরা সকলের কথার সাথে যুক্ত।

‘এইচএলপি ফাউন্ডেশন আগামীদিনে দেশ ও বিদেশে উত্তম চর্চা সম্প্রসারণে কাজ করবে’

..... ১ম পৃষ্ঠার পর

নিবেদিত এবং নিরলসভাবে সারাদেশে এ কর্মসূচি ছড়িয়ে দেয়ার কাজ করে যাচ্ছেন।

এটিতো পুরোপুরি প্রকল্প ভিত্তিকই থেকে যাচ্ছে? এর উত্তরে বলা যায় যে, এটি ঠিকই যে এখন পর্যন্ত এর কাজ বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের সহযোগিতায় বাস্তবায়িত হয়েছে এবং হচ্ছে। তবে এবারের প্রকল্পটি হচ্ছে এইচএলপি’র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা। বর্তমানে এ কাজ এমনভাবে চলছে যাতে করে বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে এটি প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়। এটি এতোদিন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক ছিলো। এখন এটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি রেল মন্ত্রণালয়েও বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিভিন্ন রেল স্টেশনগুলোর ভালো শিখন চিহ্নিত করে মানুষকে সেবা দেয়ার ক্ষেত্রে এটি একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। আরো কয়েকটি জায়গায় এটি ব্যবহার করার জন্য আলোচনা চলছে।

যারা এ কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত হচ্ছে, তারা কেন এ পদ্ধতিতে কাজ করতে চাচ্ছে? এখানে বলা যায় যে, সরকারি খাতে কোন কিছু করতে হলে অনেক অর্থের প্রয়োজন হয়। একটি প্রকল্প লাগে। একটি কর্মসূচি লাগে। সেখানে অর্থ ছাড় করা থেকে শুরু করে সরকারের বিভিন্ন নিয়মকানুনের মধ্যে কাজ করতে হয়। কিন্তু এখানে পূর্ব নির্ধারিত কোন নিয়মকানুন নেই। একটি ভালো কাজ কোথাও হচ্ছে সেটি জানা গেলো, সেটি আগ্রহীরা দেখলেন ও জানলেন এবং পরবর্তীতে ইউনিয়ন পরিষদ তার নিজস্ব অর্থায়নে এ কাজটি বাস্তবায়ন করতে পারছে। এটি তেমন কঠিন বিষয় নয়, একটি ভালো কাজকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে কাজ সম্প্রাসারণ করা এখানকার মূল কাজ। এখানে তেমন কোন জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হচ্ছে না। এজন্যই এই কর্মসূচির সুবিধা অনেক।

২০১৫ সালে ১,২০০টি ইউনিয়নে এইচএলপি তার কার্যক্রম পরিচালনা করে। তবে চলতি প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২২ সালের মধ্যে ২,০০০ টি ইউনিয়নে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে। আশার কথা হলো, প্রকল্প এলাকার বাইরেও অনেক ইউনিয়ন পরিষদ নিজ উদ্যোগে এইচএলপি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

স্থানীয় সরকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নের ফলে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে। তবে এ পরিবর্তনকে আরো দ্রুত করতে নানামুখী পদক্ষেপ নিতে হবে। সরকার অবশ্য ইউনিয়ন পরিষদকে শক্তিশালী করতে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদের অনেক কাজ। কিন্ত সে কাজ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন দক্ষ ও পর্যাপ্ত জনবল। বর্তমানের তুলনায় জনবল আরো বাড়ানো দরকার। তবে, এসব জনবলকে যথাযথ প্রশিক্ষিতও করা দরকার। এখানে একটা কথা বলে রাখা ভাল যে, পারস্পরিক শিখন পদ্ধতিতে কম জনবল নিয়েও ভাল কাজ করা যায়। কেননা, এখানে একে অপরের হাতে হাত ধরে অগ্রসর হয়। কারো কোন ঘাটতি থাকলে তা পাশের কোন সহযোগী পূরণে এগিয়ে আসেন।

ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আইনকানুন এবং কাজের পদ্ধতি পুরোপুরি জেনে নির্বাচিত হন না। তাদেরকে শিখে শিখে কাজ করতে হয়। তারা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি অর্থাৎ জনগণের নেতা। তাদের কাজগুলো যথাসময়ে মনে করিয়ে দেয়ার মত অর্থাৎ তাদের সহায়ক হিসেবে কাজ করার মতো পর্যাপ্ত জনবল দরকার। তাছাড়া জগণের সঠিক কাজটি সঠিক সময়ে করার জন্য দরকার একটি উপযুক্ত পরিবেশ, যেটা ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে। এখানে পারস্পরিক শিখন কর্মসূচি ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান নির্বাচিত প্রতিনিধি ও তাদের সহযোগীদের মধ্যে একটি সেতু বন্ধন তৈরিতে ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এর মাধ্যমে তাদের মন-মানসিকতায় ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে। জনগণের তাদের কাঙ্খিত সেবা পাওয়ার দ্বার উন্মোচিত হতে শুরু করেছে।

এ সমস্যা দুর করার উপায় একটাই, তা হচ্ছে সরকারকে ইউনিয়ন পরিষদে লোকবল বাড়াতে হবে। সে লোকবল যাতে কাজ করতে পারে সে ধরনের সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। পাশাপাশি কাজের জবাবদিহিতা থাকতে হবে। তবে জবাবদিহিতা চাওয়ার আগে কাজটি তারা যাতে যথাযথভাবে করতে পারেন সেজন্য পরিবেশ তৈরি করে দেয়া দরকার।

২০০৭ সাল থেকে শুরু হওয়া এইচএলপি’র মূল্যায়ন হিসাবে আমি বলছি যে, আমরা উন্নয়ন বলতে অবকাঠামো উন্নয়ন বুঝি। উন্নয়ন খাতে নিয়োজিতদের উন্নয়ন বিষয়ক ভাবনায় ঘাটতি রয়েছে। অবকাঠামো উন্নয়ন যেমন রাস্তাঘাট না হলে উন্নয়ন হয়নি বলে ধরে নেয়া হয়। এ বাস্তবতায় এইচএলপি একটি জীবন দর্শনও বটে। এখানে কারো কাজের প্রশংসা করাই মূল বিষয়। প্রথাগতভাবে আমরা যখন কারো দোষ ও গুণ উভয়ই দেখতে যাই, তখন ভালো গুণ বা বিষয় বের হয়ে আসে না। যেহেতু আমরা একটা দীর্ঘদিনের চিন্তার কাঠামোর মধ্যে রয়েছি এটি থেকে বের হয়ে আসা কঠিন চ্যালেঞ্জ। এটি খুবই সহজে হয় না। এজন্য সময় দিতে হয়। এজন্য কিছু নিবেদিত কর্মী দরকার। নিবেদিত কিছু বিভাগ থাকা দরকার। সেটি আস্তে আস্তে হচ্ছে। যেমন, সরকারি কর্মকর্তারা অনেকেই আগে বিশ্বাস করতেন না যে, অর্থ ছাড়া কোন কাজ হয়। একইসঙ্গে আমরা প্রথাগতভাবে অন্যের দোষ খুঁজি। কিন্তু এইচএলপি’র মধ্যে আমরা ভালো জিনিস খুঁজে বের করি, ভালো জিনিস দেখবো, ভালো কাজ করবো এবং ভালো কাজ অন্য জায়গায় ছড়িয়ে দিবো এটিই এইচএলপি’র কাজ। এই চিন্তার চক্রটি রাতারাতি সবাই বুঝে যাবেন এবং সেভাবে কাজ করবেন আমরা তা মনে করি না। তবে আশার কথা হলো যে, তৃণমূলের লোকেরা এ দর্শনটি খুব তাড়াতাড়ি বুঝতে ও ধারণ করতে পারছেন। কারণ তারা জটিল না। তারা ভালো কাজকে ভালোই বলেন এবং খারাপকে খারাপই বলেন। সেজন্য এটি ইউনিয়ন পর্যায়ে বিস্তৃত হচ্ছে।

এদিকে ইউনিয়ন পরিষদে প্রতি পাঁচ বছর পর পর নির্বাচিত নেতৃত্বের পরিবর্তন ঘটছে। এ কর্মসূচির ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে এটিও একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ পরিবর্তনের কারণে সেখানে প্রশিক্ষিত জনবল থাকছে না। সেখানে যে নতুন নেতৃত্ব আসছে এবং তাদেরকে আবার প্রস্তুত করতে সময় লাগে।

এনআইএলজির’র মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের বাইরেও এ বিষয়ে কাজ চলছে। বিভিন্ন মন্ত্রনালয় বা বিভিন্ন বিভাগে এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের কাজ চলছে। প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের কাজগুলো যেভাবে হওয়ার কথা সেভাবে কি হচ্ছে? অনেক জায়গায় হচ্ছে। ইউনিয়ন পরিষদ নিজেরাই এ কাজ করছে। এক ইউনিয়ন পরিষদের কাজ দেখে আরেকটি ইউনিয়ন পরিষদ এ কাজ করছে। এখন আমরা রেল মন্ত্রালয়ের ছড়িয়ে দিচ্ছি। আস্তে আস্তে এটি অন্য জায়গায় ছড়াবে। এ পরিবর্তন খুব দ্রুত দেখার সুযোগ নেই। এখানে পরিবর্তন আসতে সময় লাগবেই।

এ প্রক্রিয়া চালু রাখার জন্য এক ধরনের প্রশিক্ষিত জনবলের দরকার। প্রশিক্ষিত জনবল নিয়মিত তৈরি করতে হলে প্রশিক্ষণ চালু রাখতে হবে। পাশাপাশি এটিকে ছড়িয়ে দেয়ার জন্যও তৎপরতা দরকার। সেক্ষেত্রে কী কী কাজ হচ্ছে? এখানে এনআইএলজি মূল ভূমিকা পালন করছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে যখন নতুন নেতৃত্ব আসে তখন তারা দেশব্যাপি এক ধরনের প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে। এই প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীদের এইচএলপি সম্পর্কে জানানো হয়। বর্তমানে যেটুকু জানানো হচ্ছে আগামীদিনে যেনো আরো বেশি জানানো হয় সে প্রস্তাবনা এনআইএলজিকে দেয়া হয়েছে। এনআইএলজি এ প্রস্তাবনা বিবেচনা করবে বলে জানিয়েছে।

এনআইএলজি যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে থাকে তাতে দেখা গেছে যে, প্রশিক্ষণের আওতায় আসার আগে নির্বাচিত নেতা হিসেবে কারো কারোর মেয়াদই শেষ হয়ে যায়। তবে এখন এনআইএলজি’র কাজের পদ্ধতিতে পরিবর্তন হয়েছে। সব কাজই যে এনআইএলজি করবে এটি তারা মনে করছে না। আগেও বেশ কিছু এনজিও এইচএলপি বাস্তবায়নের সাথে জড়িত ছিল। বর্তমানে বেশ কয়েকটি এনজিও একই কাজ করছে। এভাবেই এনজিওরা এইচএলপি সম্পর্কে দক্ষ হয়ে উঠছে।

এখানে যে কাজগুলো হচ্ছে এর পিছনে রয়েছে দাতাগোষ্ঠীর অর্থ। এ অর্থ না থাকলে কি এ কাজ তারা করবে? উত্তরে বলা যায় যে, এনআইএলজি’র প্রশিক্ষণ সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত হয়ে থাকে। নির্বাচনের পর নিবাচিত প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণের জন্য সরকারের অর্থ বরাদ্দ রয়েছে। এ প্রক্রিয়ার যেসব এনজিও জড়িত আছে বা ছিলো তাদেরকে আগামীদিনে তারা কাজে লাগাতে পারেন। তাদের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করলে সারাদেশে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা যাবে।

এইচএলপি ফাউন্ডেশন এইচএলপি বিস্তারের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। যারা দীর্ঘদিন যাবৎ এইচএলপি’র সাথে জড়িত ছিলেন তাদের দক্ষতা যাতে কাজে লাগানো যায় এজন্যই এ উদ্যোগটি নেয়া হয়েছে। আমাদের এ প্রতিষ্ঠানটিতে দীর্ঘদিনের এইচএলপি বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ জড়িত হয়েছেন। শুধুমাত্র দেশের মধ্য থেকেই নয়, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, ইরান, মঙ্গোলিয়া ইত্যাদি দেশের এইচএলপি বিশেষজ্ঞরা এ প্রতিষ্ঠানে যুক্ত হয়েছেন। ইতোমধ্যে আমাদের এ ফাউন্ডেশন ডাচ সরকারের ‘রাইট টু গ্রো’ নামক একটি প্রকল্পে ম্যাক্স ফাইন্ডেশন ও দক্ষিণ আফ্রিকার সিগা নামক এনজিও’র সাথে যৌথভাবে ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট ট্র্যাকিং বিষয়ে একটি গবেষণাধর্মী কার্যক্রমে যুক্ত হয়েছে।

যেহেতু এ ফাউন্ডেশনটি উত্তম চর্চা সম্প্রসারণ সম্পর্কিত একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান, সেজন্য এনআইএলজি’র মতো প্রতিষ্ঠানকে এইচএলপি বাস্তবায়নে সহযোগিতা অনায়াসেই করতে পারে। আমরা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এইচএলপি বিষয়ক প্রশিক্ষিত মানব সম্পদ তৈরি করতে চাই। যেখানে যখন যে ধরনের মানব সম্পদের প্রয়োজন হবে আমরা যাতে সেখানে তা দিতে পারি সে লক্ষ্যে এখানে কাজ হবে। প্রশিক্ষণ ছাড়াও এইচএলপি বিষয়ক অনান্য কাজও এখানে করা হবে। পাশাপাশি সরকারও প্রশিক্ষণের উপর বেশ জোর দিয়েছে। তবে প্রশিক্ষকের খুব অভাব। তাই প্রশিক্ষক তৈরি করা আমাদের একটি অন্যতম কাজ।

আমরা আগ্রহীদের প্রশিক্ষিত করে একটি প্রশিক্ষক পুল তৈরি করবো। এ পুলটি এমনভাবে তৈরি করা হবে যাতে করে তাৎক্ষণিকভাবে আমরা প্রশিক্ষক দিতে সক্ষম হই। বেশিরভাগ ইউনিয়ন পরিষদের সচিবরাই এইচএলপি সম্পর্কে উৎসাহিত এবং তারা এইচএলপি সম্পর্কে জানেন। যেসব ইউনিয়ন পরিষদের সচিবরা অবসরে চলে যাবেন তাদেরকেও আমরা এই প্রশিক্ষণ পুলে রাখবো। এখানে বহু ধরনের লোককে সম্পৃক্ত করা হবে। আমরা কাজ করার জন্য আস্তে আস্তে নিজেদের সক্ষমতা বাড়াচ্ছি। কী কী কাজ আমাদের করা দরকার সেগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি। এটি একটি আত্মনির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান হিসাবে দাঁড়াবে এবং এইচএলপি ফাউন্ডেশন আগামীদিনে দেশ ও বিদেশে উত্তম চর্চা সম্প্রসারণে কাজ করবে।

সাজেক ইউনিয়ন পরিষদ থেকে সেবা পাওয়ার জন্য পায়ে হেটে পরিষদে পৌঁছতে এলাকাবাসীর এক বা দু’দিন লেগে যায়

..... ১ম পৃষ্ঠার পর

এলাকায় কোন অবকাঠামো তৈরির কাজ করতে গেলে নির্মাণ সামগ্রী পরিবহন করার মতো কোন যানবাহন ব্যবহার করা যায় না। স্কুলগুলো টিনের চালা ও বাঁশের বেড়া দিয়ে তৈরি। ইউনিয়ন পরিষদ থেকে যেসব সেতু নির্মাণ করা হয় সেগুলো কাঠের সেতু। কারণ সেতু নির্মাণের জন্য ইট, বালি, সিমেন্টসহ নির্মাণ সামগ্রী পরিবহন করার মতো কোন ব্যবস্থা এখানে নেই।

এলাকার প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হচ্ছে জুম চাষ। তবে কেউ কেউ বাড়িতে পশু পালন করে থাকেন। তাছাড়া এলাকাবাসী হলুদ ও আদা ইত্যাদির চাষ করেন। দুর্গম এলাকা হওয়ার কারণে এ ইউনিয়নের লোকজন স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মতো প্রয়োজনীয় মৌলিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও শিক্ষকদের স্বল্পতা রয়েছে। শিক্ষকদের আবাসন সমস্যা থাকায় বাইরে থেকে গিয়ে অনেকেই সেখানকার জীবনের সাথে মানানসই হতে পারেন না। এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহের সুবিধা তৈরি হয়নি।

সাজেক ভ্যালি থেকে ইউনিয়ন পরিষদ ট্রেড লাইসেন্সের ফিস ছাড়া অন্য কোন ধরনের আয় পায় না। সাজেক ভ্যালি চালু হওয়ায় এলাকাবাসীর কিছুটা হলেও অর্থনৈতিক সুবিধা বেড়েছে। স্থানীয় পণ্য পর্যটকদের কাছে বিক্রি করে বেশি দাম পাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। এতে করে ভ্যালিকেন্দ্রিক যাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হচ্ছে।

স্থানীয় পর্যায়ে কারবারী ও মেম্বারদের মাধ্যমে সভা করে আমরা তিনটি গ্রেডে ভাগ করে

ওয়ার্ড সভা

গৃহস্থালী কর আদায় করি। ‘এ’ গ্রেডে কর হচ্ছে ৮০ টাকা, আর ‘বি’ গ্রেডে ৬০ টাকা এবং ‘সি’ গ্রেড ৪০ টাকা। এভাবে ইউনিয়ন পরিষদ বছরে প্রায় দুই লাখ থেকে দুই লাখ দশ হাজার টাকা আয় করে। জনপ্রতিনিধিদের সম্মানী, গ্রাম পুলিশের ভাতা, সচিবের বেতনের অংশসহ পরিষদের আনুসঙ্গিক ব্যয় এ আয় থেকে মেটানো হয়। ভ্যালিতে বিভিন্ন সময় ভিআইপিরা আসেন, তারা না চাইলেও ইউনিয়ন পরিষদ থেকে তাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়।

আমি ২০১৫ সাল থেকে সচিব হিসাবে এ ইউনিয়ন পরিষদে কাজ করছি। আমি সবার সাথেই ভালো সম্পর্ক রেখেই কাজ করি। ২০১২ সালের আদমশুমারী এ ইউনিয়নের জনসংখ্যা হচ্ছে ২৭,৮১০ জন। গত ছয় মাস আগে মেম্বারদের মাধ্যমে করা গণনা অনুযায়ী জনসংখ্যা প্রায় ৪৫,০০০ জন। আমরাও দেশের অন্যান্য এলাকার ইউনিয়ন পরিষদের মতো স্থানীয় সরকারের নিয়ম অনুযায়ী কাজ করি। তবে এটি একটি দুর্গম এলাকা, কাজেই এ এলাকার প্রতি সরকারের বাড়তি নজর আছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবং বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এই এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকে।

চেয়ারম্যান ও মেম্বাররা পরিষদের কাজ পরিচালনা করতে আন্তরিকভাবে সচিবকে সহযোগিতা করেন। এলাকার যাতায়াত ব্যবস্থা যথাযথ না থাকায় সকল কাজ মনিটরিং করাও একটি চ্যালেঞ্জ। বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্টের প্রতিনিধি এবং কারবারিদের মাধ্যমে কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে পারি।

দুর্গমতা থাকা সত্ত্বেও এখানে ওয়ার্ড সভা কার্যকর রয়েছে। প্রতিটি ওয়ার্ড সভায় এলাকাবাসীর উপস্থিতি ভালো হয়। গত তিন বছর ধরেই বলা যায় যে, ওয়ার্ড সভা বেশ কার্যকরভাবে হচ্ছে। স্থায়ী কমিটিগুলো গঠন করা আছে। বিভিন্ন বাস্তবতার কারণে এসব কমিটির সভা নিয়মিত করা যায় না। তবে পরিষদের মাসিক সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়। চেয়ারম্যান ও মেম্বাররা তাদের রুটিন মাফিক পরিষদে অফিস করেন।

ইউনিয়নে স্থায়ীভাবে দুটি কমিউনিটি ক্লিনিক এবং একটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে। পাশাপাশি মাঝে মধ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীও এলাকাবাসীকে চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকে।

এলজিএসপি’র কারণে এই এলাকায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে। গতবছর থেকে এই ইউনিয়ন পরিষদে এমআইএস পুরোপুরি কার্যকর আছে।

আমরা মোবাইল ফোনের সিম বা মডেমের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহার করি। আমাদের অফিসে ইন্টারনেট ভালো পাওয়া যায় কিন্তু বাইরে গেলে ইন্টারনেটের স্পিড ভালো পাওয়া যায় না। এখনো ইউনিয়নের বেশিরভাগ এলাকা মোবাইল নেটওয়ার্কের বাইরে আছে।

দেশে মানসিক স্বাস্থ্য সেবা অবহেলিত, এ বিষয়ে সেবা বাড়ানোর উদ্যোগ দরকার

ফাতেমা পুতুল
মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষক

আবেগ এবং আত্মিক যে সহন ক্ষমতা অর্থাৎ আমাদের চারপাশে যে দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা এবং হতাশা এসব কিছুর মধ্যে টিকে থেকে জীবনকে উপভোগ করা এবং জীবনের প্রতিদিনের কার্যক্রমগুলো সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার বিষয়গুলো মানসিক স্বাস্থের বিষয়। সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্কগুলো টিকিয়ে রাখার সক্ষমতা এবং নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাসসহ বিষয়ই হচ্ছে মানসিক স্বাস্থ্যের অন্তর্ভূক্ত।

আমরা যে ভালো আছি তা কীভাবে বুঝবো? এর উত্তরে বলা যায়, আমি কীভাবে চিন্তা করছি, অনুভব করছি, আমি কী আচরণ করি যা জানা দরকার। আরেকটি হচ্ছে যে, আমরা কীভাবে প্রত্যাহিক জীবনের সাথে মানিয়ে চরি তাও জানা দরকার। আমরা নিজেদের জীবন ও ভবিষৎ সম্পর্কে কী ভাবি এবং আমার নিজের সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস কেমন এসব হচ্ছে মানসিক স্বাস্থ্যের পরিমাপক। এগুলো দিয়েই আমি বুঝতে পারবো যে, আমি কেমন আছি বা আমার চারপাশটা কেমন আছে বা সবাই কেমন আছে।

প্রথমে আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যকে বুঝা উচিত। আমরা মানসিক স্বাস্থ্যকে গুরুত্ব দেই না বা দিতে চাই না। যেমন স্বর্দি বা জ্বরের মতো কোন রোগ হলে আমরা ডাক্তারের কাছে যাই, নিজেরাও ওষুধ খাই। কিন্তু যদি দীর্ঘদিন মন খারাপের কারণে স্বাভাবিক কাজ করতে পারছি না তখন কিন্তু আমরা কারো পরামর্শ নিচ্ছি না, কারণ এটাকে আমরা স্বাভাবিক মনে করি ।

আমার জানা দরকার, মানসিক স্বাস্থ্য কী এবং সুস্থতা কী? যদি বলতে চাই জীবনে দুঃখ, কষ্ট, চাপ, টেনশন এগুলো থাকবেই, তার মধ্যেই আমরা স্বাভাবিক কার্যক্রম করতে করছি। আমি প্রথমেই বলি, ঢাকা শহরের কথা। আমরা সকালে বাসা থেকে বের হয়ে বাসের জন্য অপেক্ষা করে বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়াই। বাস রাস্তার মাঝখানে বারংবার থামছেই। বাসে বসেই চিন্তা করছি যে, আজকে অফিস পৌঁছতে দেরি হবে, সেখান থেকেই মানসিক চাপ শুরু হচ্ছে। অফিসে গেলাম এবং গিয়ে দেখলাম যে, আমাকে অফিসে অনুপস্থিত দেখিয়ে লাল কালির দাগ দেয়া হয়েছে। শুরু হলো আরেক মানসিক চাপ। অফিস রুমে যেতেই সহকর্মী বললেন যে, কী ব্যাপার আপনিতো প্রতিদিনই দেরিতে অফিসে আসেন। এ কথারও আমি কোন প্রতিবাদ করছি না। মানসিক চাপ বেড়েই চলছে। কিছুক্ষণ পর বস বললেন যে, রিপোর্ট কিন্তু দুপুরের মাঝেই যেনো পাই। মানসিক চাপ আবারও বাড়ার কারণ তৈরি হলো। দুপুর পেরিয়ে বিকেল হলো কিন্তু আমার রিপোর্ট শেষ হলো না। চারটায় যাওয়ার সময় বস বলে গেলেন যে, রিপোর্ট যেনো শেষ করে বাসায় যাই। আবার বাসা থেকে ফোন এলো যে, বাসায় কিছু নেই, বাসার জন্য বাজার করে নিয়ে যেতে হবে। কাজ শেষ করে রাত নয়টায় বাসায় গিয়ে দেখি পরিবারের অনান্য সদস্যরা না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। অফিসের চাপের মধ্যে কাজগুলো অতিবাহিত করছি। সাথে বাসার চাপও এসে যোগ হলো। চাপগুলোর কারণে বাসার মানুষের সাথে খারাপ আচরণ করা শুরু করি, পরিবারে বিশৃংখলা সৃষ্টি করি, তখন আমার বুঝতে হবে যে, আমি ঠিক নেই। বন্ধুদের সাথে সামাজিক সম্পর্ক ছিলো কিন্তু সেটিও বজায় রাখতে পারছি না। তার মানে হলো যে, আমি কোন সমস্যার মধ্যে আছি। তখন আমাকে বুঝা দরকার এটাতো আমার স্বাভাবিক গতিবিধি না। আমিতো আগে সবকিছু বজায় রেখে চলতে পারতাম, তার মানে আমার এখন এসব ধারণ করার ক্ষমতা কমে গেছে। অতএব এখন আমার নিজের দিকে ফিরে দেখা দরকার।

মানসিক স্বাস্থ্য এমন একটা ব্যাপার যে এ বিষয়কে বিবেচনায় আনার জন্য আপনি কাউকে বাদ দিতে পারবেন না। আমার পরিবারে পাঁচজন লোক আছে। আমি আগে আমার পরিবারের পাঁচজন লোকের সাথে কথা বলবো। প্রাত্যহিক জীবনে চাপ থাকবেই। কারণ আমাদের জীবনের রোজ চাহিদা কমছে না বরং বাড়ছে। এসব কিছু বিবেচনা করে আমি আমার ঘর থেকে এ বিষয়ে কাজ শুরু করতে পারি। সমস্যাগুলো আমি আমার অফিস সহকর্মীদের সাথে আলোচনা করতে পারি। পরিসংখ্যান বলছে, ১৫ থেকে ২৫ বছর বয়সীদের মাঝে মানসিক রোগী বেশি। বয়ঃসন্ধিকাল থেকেই মানসিক রোগের সমস্যা বেশি ঘটে থাকে। কাজেই এখানে শুধু তরুণ বা তরুণীকে এই কর্মসূচির আওতায় আনলে চলবে না। এখানে তাদের শিক্ষক ও অভিভাবকদের যুক্ত করতে হবে। কারণ সংশ্লিষ্ট সবাই এ সম্পর্কে জানতে না পারলে এখানে পুরো কাজ হবে না।

আমার ফার্স্ট এইডার তৈরি করছি। যারা প্রাথমিকভাবে মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয় পরিচালনা করবে। তাদেরকে এজন্য যথাযথ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। একজন তরুণ বা তরুণী আরেকজন তরুণ বা তরুণীর সমস্যা ভালোভাবে বুঝতে পারে। মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন যে, মানসিক অসুস্থতার ঝুঁকি কমাতে হলে শৈশবকে গুরুত্ব দিতে হবে। একটি শিশু যদি তিক্ত শৈশব নিয়ে বেড়ে উঠে তবে তার যথাযথ মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হতে পারে।

সমাজের ভূমিকা কী? মানুষ সমাজে বাস করে। বিভিন্ন সমস্যায় থাকা লোককে আশপাশের লোকেরা হয়তো মানসিক রোগী বানিয়ে দিতে পারে। এখানে সচেতনতা তৈরির জন্য ব্যাপক কাজ হওয়া দরকার। তৃণমূলের জনগণকেও এখানে বাদ দিলে চলবে না। এ কাজে আমরা ইউনিয়ন পরিষদকে সম্পৃক্ত করতে পারি। সেখান থেকে আমরা পরিবর্তন শুরু করতে পারি। তাদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা দরকার।

আপনি বিষন্নতার মাঝে সময় কাটাচ্ছেন। এটি যদি টানা দু'সপ্তাহের বেশি সময় চলে তাহলে ভাবতে হবে এটি রোগ। যার কারণে আপনার পারিবারিক বা কর্মজীবনে স্বাভাবিকতা হারাচ্ছে। তখন আপনার মনোরোগ চিকিৎসকের কাছে যাওয়া দরকার। উদ্বেগ যখন রোগে পরিণত হয় তখন এর যথাযথ প্রতিকারের উদ্যোগ নিতে হবে। আপনার আশপাশে এমন কাউকে দেখলে তার পাশে আপনার দাঁড়ানো উচিত।

ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ে আমরা যশোরে সম্প্রতি কাজ করেছি। এই কাজে কমিউনিটি লিডার ও ধর্মীয় নেতারা সম্পৃক্ত ছিলেন। কমিউনিটি লিডারের মধ্যে ছিলেন, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে ছিলেন, ইমাম ও পুরোহিত। অর্থাৎ সমাজে পরিবর্তন আনতে যারা ভূমিকা রাখতে পারেন এমন ব্যক্তিদেরই এখানে যুক্ত করা হয়। এটি দু'দিনের প্রশিক্ষণের কথা থাকলে তাদেরকে এক নাগাড়ে দু'দিন পাওয়া কষ্টকর কাজ। তাই মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন করার জন্য আমরা একদিনের একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকি। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষিত নারী আসনে যারা নির্বাচিত হয়ে আসেন তাদের বেশিরভাগই কর্মস্থলে কাজের যথাযথ সুযোগ পান না। এ সমস্যার সমাধান করতে হলে কর্মস্থলকে নারীবান্ধব করতে হবে। অর্থাৎ নারীকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবেশ তৈরি করে দেয়াকে ন্যায্যতা হিসেবে বিবেচিত হয়। সেখানে প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্টদের জেন্ডার বিষয়ক সচেতনতা তৈরির উদ্যোগ নিতে হবে।

আমাদের দেশে মানসিক স্বাস্থ্য সেবার পরিস্থিতি কেমন? এটি প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। তারপরও সরকার বিভিন্ন জেলা হাসপাতালে একজন করে সাইক্রিয়াটিক রাখার ব্যবস্থা করেছে, এটাও একটা আশার আলো। তাছাড়া প্রত্যেক জেলা হাসপাতালে 'ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার' আছে। এই 'ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে' বিশেষ করে নারী এবং শিশুরা নির্যাতনে শিকার হলে এখানে স্বাস্থ্য সেবা পায়। মানসিক স্বাস্থ্যসেবাও এখানে পায়। স্থানীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবার মান যেভাবে নিশ্চিত হচ্ছে কিন্তু সে তুলনাই মানসিক স্বাস্থ্য সেবা দেয়া হচ্ছে না। কমিউনিটি ক্লিনিকে একজন কাউন্সিলর রাখা যেতে পারে। একটি ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে একজন মাত্র সাইক্রিয়াটিক আছেন। তার পক্ষে পুরো জেলার জন্য কাজ করা সম্ভব না। বেসরকারি ক্লিনিকে কোথাও কোথাও সাইক্রিয়াটিক রয়েছেন।

কিন্তু স্থানীয় পর্যায়ে এ বিষয়ে কাজ করার মতো কী প্রশিক্ষিত জনবল আমাদের আছে? বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ বিষয়ে ডিগ্রীধারীরা বের হচ্ছেন। কিন্তু তারা হয়তো স্থানীয় পর্যায়ে কাজ করতে প্রস্তুত নাও থাকতে পারেন। কারণ আমরা এখনো উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালে সকল ডাক্তারের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে পারিনি। আমরা ফাস্ট এইডার তৈরি করছি, যারা স্থানীয় লোক এবং স্থানীয় পর্যায়ে কাজ করবেন। তাহলে স্থানীয় পর্যায়ে কাজের জন্য ঢাকা থেকে লোক নেয়ার দরকার নেই। আমি যদি স্থানীয় পর্যায়ে ১০ থেকে ২০ জন ফাস্ট এইডার তৈরি করতে পারি আর তাদের যদি নিয়োগ দানের সুযোগ করে দিতে পারি তাহলে স্থানীয় পর্যায়ে এ সমস্যা সমাধান করা সম্ভব। কর্তৃপক্ষ চাইলে আমরা সারাদেশে এই কর্মীবাহিনী তৈরি দিতে পারি।

আমি ২১ বছর যাবৎ উন্নয়ন খাতে কাজ করছি। আমার জীবনে প্রথম কাজ ছিল এসিড সার্ভাইভারস ফাউন্ডেশন। যেখানে এসিড সহিংসতার শিকার নারীদের নিয়ে কাজ করতে হয়েছে। সেখানে দীর্ঘ ১৪ বছর কাজ করেছি। সেখানেও আমার কাজের বিষয় ছিলো মানসিক স্বাস্থ্য। একজন এসিড ভিকটিম এসিডের সন্ত্রাসের কারণে তার আগের চেহারা হারিয়ে ফেলেন। তাকে সমাজে পূর্বের অবস্থায় ফেরত পাঠানোর সাথে মানসিক ও সামাজিক বিষয় জড়িত। তার শরীরের যে ক্ষয়, তার থেকেও বেশি মনের ক্ষয় হয়। সে জায়গা পূরণ করা এবং তাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ফাউন্ডেশনে আমরা কাজ করেছি। মানবধিকার বিষয়ে প্ল্যান ইন্টারন্যাশনালেও কাজ করেছি। তারপর এডিডি ইন্টারন্যাশনালে প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করেছি।

এসিড সার্ভাইভারস ফাউন্ডেশনের সাবেক নির্বাহী পরিচালক মনিরা রহমান ও আমি মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করার জন্য ইনোভেশন ফর ওয়েলভিং ফাউন্ডেশন (www.iwellbeing.org) চালাচ্ছি। আমরা ২০১৪ সাল থেকে কাজ শুরু করেছি এবং ২০১৫ সালে বাংলাদেশে প্রথম মানসিক স্বাস্থ্যের প্রাথমিক চিকিৎসা আমাদের হাত ধরেই বাংলাদেশে আসে। বাংলাদেশসহ ২৪টি দেশে এ মানসিক রোগের প্রাথমিক চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে এবং মডিউলটি অস্ট্রেলিয়ার একটি ইউনিভার্সিটি তৈরি করেছে। সে অনুযায়ী আমরা প্রশিক্ষণ করাচ্ছি।

'মানসিক স্বাস্থ্য প্রাথমিক চিকিৎসা' বিষয়ক প্রশিক্ষণ চলছে

সম্পাদক ও প্রকাশক : সমর রায়
প্রকাশক কর্তৃক মিডিয়া প্রফেশনালস গ্রুপ, ২৭ শহীদ বুদ্ধিজীবি মুনীর চৌধুরী সড়ক (সেন্ট্রাল রোড), ঢাকা ১২০৫ থেকে প্রকাশিত
এবং ইত্যাদি প্রিন্টার্স, ৮/৯ নীলক্ষেত,বাবুপুরা, ঢাকা ১২০৫ থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ৯৬৬৭২৮৪, ই-মেইল : mediaprofessionals@gmail.com